অতিমারী প্রতিরোধে সংস্কৃতশাস্ত্রের দ্বারদেশে

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির এক বিশ্ব। মানুষ তার মেধা, সাধনা ও গবেষণা দ্বারা সমগ্র বিশ্ব জয় করে চলেছে। নভস্তল থেকে অধস্তল সর্বত্র তার অবাধ বিচরণ। নিত্য নতুন আবিষ্কারে বহুবিধ রোগ ও সমস্যা থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে, তা শতাব্দী কিংবা অর্ধ-শতাব্দী পরে হোক, কিছু অজ্ঞাত জীবাণু (ভাইরাস) বিশ্বের কোনো প্রান্ত বা সমগ্র বিশ্বকে ওলট-পালট করে দেয়। এতে প্রাথমিকভাবে আকস্মিক আক্রমণে মানুষ হতবিহ্বল হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়। তবে এই জয় তাৎক্ষণিক হয় না। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আমাদের জ্ঞাত তথ্য বা জ্ঞান যখন কার্যকর হয় না, তখন আমরা খুঁজে ফিরি আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত দর্শন, শাস্ত্র বা সাহিত্যে। তাঁদের সৃষ্টির দ্বারদেশে গিয়ে যদি কোনো ফল পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধের উপস্থাপনা।

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্ব আক্রান্ত করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ দ্বারা। চলমান কর্মব্যস্ত পৃথিবী আজ থমকে গেছে। হারিয়েছে তার গতি। প্রতিনিয়ত সংক্রামিত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ, বেড়ে চলেছে মৃত্যুর মিছিল। এই ভাইরাস থেকে মুক্তির পথ খোঁজার জন্য বিশ্বের বড় বড় ল্যাবরেটরিতে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতিষেধক কোনো কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। কবে হবে, তাও কেউ জানে না। এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তা কেবল কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা। এই স্বাস্থ্যবিধির সূত্র ধরে প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। আর এই উপমহাদেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য লিখিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। তাই আমরা ব্রতী হব সংস্কৃত ভাষায় রচিত দর্শন, শাস্ত্র, সাহিত্যের অনুসন্ধানে।

পৃথিবীতে কখনো কখনো এমন সময় আসে, যখন সেই সময়ের উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করা হয় নানা পথে। এই পথ উত্তরণের একটি দিক হলো, অতীত দিনের শাস্ত্র ও সাহিত্যের দ্বারদেশে অনুসন্ধান। এটিই সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা। করোনার প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। এই স্বাস্থ্যবিধিতে জীবনচর্যা এবং খাদ্যাভ্যাস অন্যতম। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে যে করোনা ভাইরাসের সূত্রপাত, সেখানে তার কারণ অনুসন্ধানের একটি কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে সেখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাসের জন্য এটা ঘটতে পারে। আমরা অতীত দিনের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, জীবনচর্যা, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, পশু-পাখিদের সঙ্গে ব্যবহার, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারি। এতে হয়তো ভাইরাসটির কোনো ওষুধ পাওয়া যাবে না, কিন্তু তার আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো নিরাময় বর্ম তৈরি হতে পারে। আমাদের অনুসন্ধানের জন্য উৎস গ্রন্থ হিসেবে আলোচনায় আসতে পারে বেদ-উপনিষদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, চরকসংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র প্রভৃতি।

বর্তমান সময়ে আমরা করোনার করালগ্রাসে আক্রান্ত হয়ে যে মহাসঙ্কটের মধ্যে আছি, তা এক অতিমারী। ইংরেজিতে একে বলা হয় প্যান্ডেমিক। এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীতে এই অতিমারী কি প্রথম দেখা গিয়েছে? ইতিহাস কিন্তু বলে শত বছর পর পর এমন অতিমারী আঘাত হেনেছে ।

অবাক হতে হয়, প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থ *চরকসংহিতায়* অতিমারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। *চরকসংহিতার* বিমানস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে 'জনপদোদ্ধংসনীয়ম্' নামে অতিমারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় 'জনপদোদ্ধংসনীয়ম্'–এর অর্থ জনপদানাং ধ্বংসানাম্ – অর্থাৎ জনপদানাং বহূনাং মানবানাং মরণম্ – যার ফলে জনপদের বহুলোকের মরণ হয়। এখানে জনপদ কেবল নির্দিষ্ট জনপদ নয়, সকল জনপদ।

কেন এই অতিমারী হয়? জনপদধ্বংসীয় রোগের কারণই বাকী? এ সম্পর্কে *চরকসংহিতায়* জনপদ ধ্বংসের জন্য চারটি প্রধান কারণ উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণগুলো ঋষি আত্রেয় তাঁর শিষ্য অগ্নিবেশকে বলেছেন। কারণগুলো হলো: অপ্রশস্ত বায়ু বা দূষিত বায়ু, অপ্রশস্ত জল বা দূষিত জল, পীড়াজনক দেশ বা দূষিত মাটি এবং বিকৃত ঋতু। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় প্রায়শ দেখা যায়, গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরে নানা বিষয়ের অবতারণা, বর্ণনা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। *চরকসংহিতা* অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায়, আত্রেয় তাঁর সময়ে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক অথবা চিকিৎসাবিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন।

উল্লিখিত কারণগুলোর মধ্যে অপ্রশস্ত বায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো: অস্বাভাবিক ঋতু-গুণবিশিষ্ট, অতিশয় জলসিক্ত, অতিবেগবান, অতিপরুষ, অতিশীত, অতিউষ্ণ, অতিরুক্ষ,

অতিস্যন্দন, অতিভীষণশব্দযুক্ত, পরস্পর অত্যন্ত প্রতিহতগতিবিশিষ্ট, অতি কুণ্ডলিত বা ঘূর্ণিত, এবং অত্যন্ত গন্ধ-বাষ্প-বালু-পাংশু ও ধূমে দূষিত।[১]

অপ্রশস্ত জল বা দূষিত জল হলো, অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ-বর্ণ-রস ও স্পর্শযুক্ত ক্লেদবহুল অর্থাৎ কর্দমাক্ত জল। জলচর বিহঙ্গরা অর্থাৎ পাখিরা থাকতে না পেরে যে জলাশয় পরিত্যাগ করেছে। শুষ্ক জলাশয়, অপ্রীতিকর ও অপগতগুণ হলে বুঝতে হবে জল দূষিত হয়েছে।[২]

পীড়াজনক দেশ বা দূষিত মাটি বলতে বোঝায়, অতিমারী হলে দেশ এরূপ অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় যে এর প্রকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিকৃত হয়ে যায় এবং ক্লেদসঙ্কুল ও নিগৃহীত হয়। তখন সরীসৃপ, ব্যাল (সাপ), মশক (মশা), শলভ (পতঙ্গ), মক্ষিকা (মাছি), মূষিক (ইঁদুর), উলুক (পেঁচা), শ্মশানবাসী পক্ষী ও জম্বুকাদি (শৃগালাদি) দ্বারা সর্বত্র উপদ্রুত হয়। মৃত্তিকা নানাপ্রকার তৃণ ও উলুপের বনে পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে নানাপ্রকার লতার উদ্ভব হয়। পূর্বে যেরূপ আকৃতির এবং পশুপক্ষী প্রভৃতির আবাস ছিল, তার ভিন্নতা হয়ে থাকে। সর্বত্রই অকৃষ্ট ভাব থাকে। শস্যাদি শুষ্ক ও নষ্ট হয়ে যায়। বায়ু ধূমযুক্ত হয়। পক্ষীসকল সর্বদাই শব্দ করতে থাকে। কুকুর চীৎকার করতে থাকে। বিভিন্ন প্রাণী ও পাখি উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যথিত হয়। ধর্ম, সত্য, লজ্জা, আচারও সমাজকে পরিত্যাগ করে। জলাশয়সকল সর্বদা ক্ষুভিত ও উদীর্ণ হতে থাকে। অর্থাৎ কখনও জল থাকে না, কখনও আবার পরিপূর্ণ হয়। সবসময় উল্কাপাত, নির্ঘাত ও ভূমিকম্প হয়। দেশ ঘোর ভয়ংকররূপে পরিণত হয়। চন্দ্র-সূর্য-তারকারাজি কখনও রুক্ষ, তাম্র এবং কখনও বা শ্বেত মেঘজালে সংবৃত থাকে। সর্বদাই যেন কোনো ভয় ও উদ্বেগ বোধ হয়। সর্বদাই যেন ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং রোদনধ্বনি শোনা যায়। যেন সতত অন্ধকার। যেন যক্ষগণ বা অদৃশ্য কোনো অশরীরী নিঃশব্দে বিচরণ করছে ।[৩]

রোগজনক কালের লক্ষণ বা ঋতুর বিকৃতি হলো, যে ঋতুতে যেরূপ লক্ষণ হওয়া উচিত যদি সেরকম না হয়ে ভিন্ন রকম হয় তাহলে বুঝতে হবে অতিমারী আসন্ন। যেমন শীতকালে যদি শীত না থাকে, গ্রীষ্মকালে যদি গরম না হয়ে কেবল বৃষ্টিই হয়। আবার বর্ষাকালে যদি বর্ষা না হয় – এভাবে ঋতুর বিকৃতি হলে জনপদধ্বংসের কারণ হয় বা অতিমারী হয়।[৪]

আমরা আরও জানতে পারি, যদি দেখা যায় প্রথমে বায়ু, পরে বায়ু হতে জল, পরে জল হতে দেশ বা মাটি, পরে দেশ হতে কাল যদি বিকৃতিলাভ করে তাহলে বুঝতে হবে জনপদধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কেন এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় ? এ প্রশ্নের উত্তরে সে

সময়ের বিচারে বলা হয়– পূর্বকৃত অসৎকর্ম। অধর্ম ও অসৎকর্মের আকর প্রজ্ঞাপরাধ (বুদ্ধির দোষ)। যথা– দেশ, নিগম, নগর ও জনপদের অধ্যক্ষেরা যখন ধর্ম ত্যাগ করে অধর্ম পথে প্রজাপালন করে। এর ফলে তাদের আশ্রিত প্রজারাও সেই অধর্ম বৃদ্ধি করতে থাকে।[৫]

জনপদধ্বংস বা অতিমারী দেখা দিলে তা থেকে মুক্তির জন্য মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে *চরকসংহিতায়* অনেক নির্দেশ দেয়া আছে। রোগের লক্ষণ ধরে ধরে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। জ্বর হলে উষ্ণ জলপানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চিকিৎসাবিদ ঋষি আত্রেয় জ্বরিত ব্যক্তিকে উষ্ণ জল পান করার কথা বলেছেন–" ক্ষিপ্রং জ্বরাং গচ্ছতি শ্লেষ্মাণঞ্চ পরিশোষয়তি স্বল্পমপি চ পীতং তৃষ্ণা প্রশমনায়োপপদ্যতে" – অর্থাৎ জ্বরিত ব্যক্তি উষ্ণ জল পান করলে তা তার বায়ুকে অনুলোম করে, অগ্নিকে দীপ্ত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, শ্লেষ্মা শোষণ করে এবং অল্প পানেই তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে। এছাড়া বিবিধ প্রকার রসায়ন সেবন করা আবশ্যক। এ সময় মানুষকে মানবিক হয়ে ধর্মপালনের জন্যও আহ্বান করা হয়েছে। সত্যাচরণ, সর্বভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চনা, সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান ও আত্মগুপ্তি (মন্ত্রাদি দ্বারা আত্মরক্ষা) আবশ্যক।[৬]

এ ছাড়াও নির্দেশিত হয়েছে, পুণ্যবান্‌জনপদসমূহের উপসেবন (দেশ পরিবর্তন), ব্রহ্মচর্য-সেবন, ব্রহ্মচারীদের আশ্রয় গ্রহণ, ধর্মশাস্ত্রসমূহ ও জিতাত্মা মহর্ষিবৃন্দের আজ্ঞাপালন এবং বৃদ্ধগণপূজিত ধার্মিক ও সাত্ত্বিকগণের সাথে বসবাস করতে হবে।[৭]

স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খাদ্যাভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। পরিচ্ছন্ন হয়ে সতেজ ও শুদ্ধ খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও মন ভালো থাকে। অশ্রদ্ধার সাথে কখনও কোনো খাবার খেতে নেই। নষ্ট ও বাসি খাবার, পশু-পাখির দ্বারা স্পৃষ্ট খাবার খেলে শরীরে রোগ-ব্যাধি হয়। শুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে মনুসংহিতায় বহু নির্দেশ ও উপদেশ রয়েছে। যে সব খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে হবে, সেসব খাদ্য মনুসংহিতায় বর্জন করার কথা নির্দেশিত হয়েছে। ভাঙা পাত্রে এবং যে পাত্র দেখলে মন খুঁত খুঁত করে, তাতে ভোজন করা উচিত নয়। আরও জানা যায়–মত্ত, ক্রুদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত অন্ন, কেশ ও কীটের সংসর্গে যে অন্ন দূষিত হয়েছে, যে অন্নে ইচ্ছা করে কেউ পা ঠেকিয়েছে, পাখিদের দ্বারা ঠোকরান এবং কুকুরের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন, নষ্ট হয়ে যাওয়া রাতের বাসি খাবার, যে অন্নের উপর কেউ হাঁচি দিয়েছে (অবক্ষুতম্) সে খাবার পরিত্যাগ করতে হবে।[৮]

শুদ্ধাচার সুস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ। পবিত্রতা ও শুদ্ধাচার তাই ধর্মেরও অঙ্গ। যেখানে সেখানে থুথু ত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগ পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করে। ভাইরাস আক্রান্ত

ব্যক্তির থুথু, হাঁচি-কাসির মাধ্যমে দ্রুত অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা তাই সকলকে ঘরের বাইরে মুখে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব দিয়েছেন। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিধি পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মনুসংহিতা, চরকসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রয়েছে শুদ্ধাচার পালনের এমন বহুবিধ নির্দেশ। বাইরে থেকে ঘরে পৌঁছে কাপড় না ছেড়ে অন্নভোজন এবং যেখানে সেখানে মলমূত্র থুথু ত্যাগকে অত্যন্ত নিন্দার কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। পথের মধ্যে, ভস্মে, গোচারণস্থানে, লাঙ্গল দিয়ে চষা জমিতে, জলে, যজ্ঞাদির জন্য সজ্জিত ইষ্টকস্তূপে, পর্বতগাত্রে, জীর্ণদেবগৃহে, উঁই এর ঢিবিতে, সর্পাদি-প্রাণিযুক্ত গর্তে, পথ চলতে চলতে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, নদীতীরে এবং একান্ত আর্ত না হলে পর্বতের শিখরদেশে মলমূত্র ত্যাগ না করার জন্য মনুসংহিতায় নির্দেশ দান করা হয়েছে।[৯]

জনস্থানে, ভোজনকালে এবং জপ-হোম-অধ্যয়ন-বলি ও মঙ্গলকার্যের অনুষ্ঠানকালে কফ ও শিক্নী পরিত্যাগ না করতে, পথে-ঘাটে যত্র-তত্র প্রস্রাব না করার জন্য *চরকসংহিতায়* রয়েছে নির্দেশ।[১০] সেখানে আরও বলা হয়েছে– মুখ না ঢেকে জৃম্ভা (হাইতোলা), ক্ষবথু (কাসি) কিংবা হাস্য করা, নাক খুঁটানো, দন্ত বিঘট্টিত করা (দাঁত ঘষা), নখ বাজানো ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর কর্ম করা উচিত নয়।[১১]

মলমূত্র ত্যাগ করার পর আচমনের নির্দেশ আছে *মনুসংহিতায়*। এভাবে মনু শুদ্ধাচারের নানা উপায় বর্ণনা করেছেন। শুদ্ধাচার সম্পর্কে মনুর এ উপদেশে সমাজে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পরিচ্ছন্নতা বিধানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল দৈহিক শুদ্ধি নয়; মনের শুদ্ধি না থাকলে মানুষ দেহ-মনে সুস্থ থাকতে পারে না। শরীরকে কেবল পবিত্র করে মনকে অপবিত্র রাখলে, মনের কালিমা দূর না করলে, কেউ সম্যকরূপে সুস্থ হতে পারে না। তাই আহারে-বিহারে, পথে-ঘাটে সকল সময়ে যেমন দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা বাঞ্ছনীয়– তেমন মনের সকল কালিমা দূর করে, মানবিক সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়ে মনকে পবিত্র রাখতে হবে। 'এই শরীর ভগবানের মন্দির'– এই কথাটি মনে বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করলে কোনো অপবিত্র ভাব মনে আসতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস করলে দেহরূপ ভগবানের এই মন্দিরকে সকল সময় পবিত্র রাখা যায়। মনের কালিমা দূর হয়ে যায়। ফলে দেহ-মনে তখন পূর্ণশান্তি বিরাজ করে। মনু দেহশুদ্ধির কথা যেমন বলেছেন, তেমনি আত্মিক শুদ্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। মনুর মতে, অন্তরের শুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি। যে সব গুণ মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, সেগুলোকে

মনু শুদ্ধতার কারণ বলে মনে করেছেন। মনুর মতে, যে লোক অর্থ অর্জনের ব্যাপারে শুচিতা অবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত শুচি। অর্থশুদ্ধি না থাকলে কেবল মাটি বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধি করলেই পবিত্র হওয়া যায় না।[১২] আরও উক্ত হয়েছে– বিদ্বান ব্যক্তি, কেউ অপকার করলেও তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের দ্বারা শুদ্ধ হন। অকার্যকারী লোকেরা দানের দ্বারা, অজ্ঞাতসারে পাপকারীরা জপের দ্বারা এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হন। জলের দ্বারা ধৌত করলে শরীর শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ হয় সৎ চিন্তা দ্বারা। জীবাত্মা শুদ্ধ হয় বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হয়।[১৩] তাই বলা যায়, মনু কেবল দৈহিক শুদ্ধতার কথা বলেননি, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে আত্মিক শুদ্ধতার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ।

রামায়ণ-মহাভারতেও মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনচর্যার নির্দেশনা রয়েছে। ধর্মশাস্ত্র মানুষকে শ্রেষ্ঠপন্থা প্রদর্শন করে। এ সম্পর্কে মহাভারতে বলা হয়েছে– মূলত ধর্মশাস্ত্র মানবের শ্রেয়ঃ নির্দেশ করে, শ্রেয়ঃ পন্থা প্রদর্শনের জন্যই বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের বিধান।[১৪]

মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্বে কতকগুলো অধ্যায়ে মানুষের করণীয় শুদ্ধাচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শয্যাত্যাগ হতে আরম্ভ করে পুনরায় শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত মানুষের কী কী করণীয় তার নির্দেশ রয়েছে মহাভারতে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করা উচিত। এ মুহূর্ত ব্রাহ্মমুহূর্ত, এ সময়ে ঘুমাতে নেই। এ সময় প্রকৃতিতে বয়ে যায় নির্মল বাতাস, যা দেহ-মনকে সুস্থ রাখে। তাই মহাভারতের নির্দেশ–'ন চ সূর্যোদয়ে স্বপেৎ' অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে।[১৫]

রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাজা দশরথ ও তাঁর পুত্রেরা ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করতেন। বনবাসী রামচন্দ্রকে ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে গেলে রামচন্দ্র ভরতকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের একটি প্রশ্ন ছিল–'কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষীঃ ক্বচ্চিৎ কালেঽববুধ্যসে'– তুমি নিদ্রার বশীভূত না হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করো তো?[১৬]

কেবল রামায়ণ মহাভারতের যুগে নয়; তারও অনেক পূর্বে প্রাচীন ঋষিগণ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সূর্যপ্রণাম করতেন। ভোরের সূর্যের আলোয় তাঁরা স্নাত হতেন। লক্ষণীয়, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা এখন সবাইকে প্রচুর সূর্যের আলো গ্রহণ করতে বলছেন। সূর্যালোকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অবাক হতে হয়, সেই প্রাচীনকালের ঋষিদের স্বাস্থ্যজ্ঞান দেখে। তাঁরা কেবল সূর্যালোকে আলোকিত হতেন না, সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সূর্যকে প্রণাম জানাতেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ। এখন করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বার বার হাত ধোয়ার কথা বলা হচ্ছে। মহাভারতে রয়েছে এমন নির্দেশ। বিশেষ করে মলত্যাগের পর শৌচাদি ক্রিয়ায় অবশ্যই হস্ত ও পদদ্বয় প্রক্ষালন করার কথা বলা হয়েছে। বাইরে ঘুরে এসে গৃহে প্রবেশের সময়েও অবশ্যই পাদশৌচ ও আচমন করণীয়। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে নলরাজার কাহিনি। তিনি পাদপ্রক্ষালন না করায় কলি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন।[১৭] কলি-আক্রান্ত বলতে আমরা এসময়ে বুঝি, চরম দুর্দশায় পতিত হওয়া। *চরকসংহিতা*তেও শৌচসম্পাদনের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে– পাদদ্বয় ও মলমার্গসমূহের সবসময় শৌচ রাখা উচিত। এর ফলে শরীর মেধ্য ও পবিত্র হয়ে থাকে, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং অলক্ষ্মী ও কলি দূর হয়।[১৮]

মহাভারতে প্রত্যহ স্নানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে– স্নানে শরীর মন পবিত্র হয়। স্নানের দশটি গুণ। যথা– বলবৃদ্ধি, রূপ, স্বর ও বর্ণের বিশুদ্ধি, সুস্পর্শ ও সুগন্ধকারিতা, বিশুদ্ধিজনকতা, শ্রী ও সুকুমার বৃদ্ধি এবং নারীপ্রিয়ত্ব।[১৯]

*চরকসংহিতায়*ও স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে– স্নান পবিত্র, বৃষ্য, আয়ুবর্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনাশক, মলনাশক, বলকারক ও পরম ওজস্কর।[২০] চরক সংহিতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্মল বসন পরিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। নির্মল বসন পরিধানের উপকারিতা সম্পর্কে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– নির্মল বসন পরিধান করলে শ্রী, যশ, আয়ু, অলক্ষ্মী নাশ, হর্ষ সভ্যতা ও প্রশংসনীয়তা হয়।[২১]

এই করোনাকালে করোনাকে মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিশ্বের সকল স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ শুদ্ধাচার পালনের জন্য বার বার পরামর্শ দিচ্ছেন। মূলত শুদ্ধাচার ধর্মের অঙ্গ। সংস্কৃত শাস্ত্র শুদ্ধাচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। মহাভারতে শুদ্ধাচার পালনেরস্পষ্ট নির্দেশ আছে– যাঁরা শাস্ত্রবিহিত আচার পালন করেন, তাঁরা স্বাস্থ্য ও স্বস্তির সঙ্গে শতবর্ষ জীবিত থাকেন এবং মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। তাই সকলের সযত্নে শুদ্ধাচার পালন করা উচিত।[২২]

এখন যোগশাস্ত্র এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত চিত্তের সুস্থিতি বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। চিত্ত সুস্থিত থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে। সুস্থ চিত্ত যেকোনো রোগ নিরাময়ে সহায়ক। আর চিত্তকে সুস্থ ও সংযত রাখতে যোগানুশীলনের উপকারিতা অনস্বীকার্য। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে যোগ শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, 'চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' আমাদের চিত্ত নানা কারণে বিক্ষিপ্ত এবং অস্থির থাকে। যোগচর্চার মাধ্যমে এই অস্থির চিত্ত সুস্থিত হয়। যার চিত্ত যত সুস্থিত তার শরীরও তত সুস্থ থাকে। এতে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।

প্যান্ডেমিক শব্দের সঙ্গে প্যানিক-এর সংযোগ আছে। দেখা যাচ্ছে যত না রোগের কারণে, তার চেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানুষ বেশি মারা যাচ্ছে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যোগের অনুশীলন খুবই কার্যকর। করোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুস্থিত চিত্তের কথা বারংবার বলা হচ্ছে। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগসূত্রের সাধনপাদে বলা হয়েছে– "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান- সমাধয়ো ঽষ্টাবঙ্গানি"– অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি হলো যোগের অঙ্গ। এগুলো নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের শরীর ও মন দুইই সুস্থ থাকে। আর শরীর ও মন সুস্থ থাকলে যে-কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে।

যম: যম সম্পর্কে যোগসূত্রের সাধনপাদে বলা হয়েছে– "অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ"– অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনকে একসাথে বলা হয় যম। যম হলো নিষেধাত্মক বিধি। কতকগুলো কর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সাধনাই হলো যম। যম যোগাঙ্গের প্রথম অঙ্গ এই কারণে যে, ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়ভোগী ও অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কখনও যোগসাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হতে পারে না।

- অহিংসা: অহিংসা হলো সর্বপ্রকারে, সর্বদা, সর্বভূতের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকা। হিংসা বলতে এখানে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার হিংসার কথা বলা হয়েছে। এই তিন প্রকার হিংসাই বর্জনীয়। অর্থাৎ, কোনোভাবেই অপরকে আঘাত করা বা ব্যথা দেয়া উচিত নয়। অহিংসার ইতিবাচক ভাব হলো মৈত্রী।
- সত্য: সত্য হলো চিন্তায় ও বাক্যে কোনোরূপ মিথ্যাচারণ না করা। তবে যোগশাস্ত্রে সত্য কল্যাণের সাথে জড়িত। কাল ও পরিবেশ নির্বিশেষে সত্য যেন অপরের কল্যাণকর হয়।
- অস্তেয়: অস্তেয় হলো চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ। যা নিজের নয় এমন দ্রব্য, এককথায় পরদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, এমন কি তাতে স্পৃহা না করাই অস্তেয়। এর দ্বারা চিত্তমল দূরীভূত হয়। এ সম্পর্কে পাতঞ্জলসূত্রে বলা হয়েছে –"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"– অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চৌর্য ত্যাগ হলে সমস্ত রত্নই প্রাপ্ত হওয়া যায়।
- ব্রহ্মচর্য: ব্রহ্মচর্য হলো কাম আচরণ ও কাম চিন্তা থেকে বিরত থাকা। ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্য হলো শরীর ও মনের পবিত্রতা।

- অপরিগ্রহ: অপরিগ্রহ হলো দেহরক্ষার বা প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত প্রকার ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বর্জন এবং অপরের দান গ্রহণ না করা।

নিয়ম: যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হলো নিয়ম। নিয়ম অর্থ নিয়মিত ব্রত পালনের অভ্যাস। যোগসূত্রের সাধনপাদে বলা হয়েছে– "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ"– অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠানকে বলা হয় নিয়ম।

- শৌচ: 'শৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা শুদ্ধি। যোগের জন্য দেহ ও মনের শুচিতা দরকার। এ কারণে শৌচ দুপ্রকার– বাহ্য ও আন্তর। প্রাত্যহিক স্নান করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, বাসগৃহ নির্মল রাখা, সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা এগুলো বাহ্য শৌচ। অপরপক্ষে, আন্তর শৌচ হলো অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা ইত্যাদি চিত্তের মলিনতা থেকে মুক্ত হওয়া।
- সন্তোষ: 'সন্তোষ' বলতে বোঝায় অহেতুক আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কেবল সন্তোষ দ্বারাই সুখ পাওয়া যায়। সন্তোষ সম্পর্কে পাতঞ্জলসূত্রে বলা হয়েছে –"সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ"– অর্থাৎ পূর্ণ সন্তোষ থেকে উত্তম সুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠসুখ লাভ হয়, যে সুখের অপর নাম দিব্যসুখ।
- তপঃ: 'তপঃ' শব্দের অর্থ তপস্যা বা ব্রত। যে যে কর্মে আপাতত সুখ হয়, সেই সেই কর্মের নিরোধের চেষ্টাকে বলা হয় তপের চর্যা। তপস্যা বা ব্রতাচারের মাধ্যমে চিত্ত দৃঢ় হয়। বস্তুত বিচলিত না হয়ে শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা সহকারে মহাব্রতের সাধনই হলো তপস্যা।
- স্বাধ্যায়: 'স্বাধ্যায়' অর্থ অধ্যয়ন ও জপ। অধ্যয়ন আত্মজ্ঞানের প্রতি স্পৃহার উদ্রেক করে এবং জপ আত্মতত্ত্বে অনুপ্রবেশ ঘটায়।
- ঈশ্বরপ্রণিধান: ঈশ্বরের ধ্যান ও সকল কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণই হলো ঈশ্বরপ্রণিধান। ' যা কিছু হচ্ছে সব ঈশ্বরের দ্বারা হচ্ছে, আমি অকর্তা'– প্রত্যেক কর্মে এরূপ ভাবনা করে সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে এইভাবে বার বার ঈশ্বরপ্রণিধান করতে করতে যোগীর চিত্তের মালিন্য দূর হয়ে স্বরূপদর্শন হয়।

আসন: অষ্টাঙ্গের তৃতীয় যোগাঙ্গ হলো আসন। আসন সম্পর্কে যোগসূত্রের সাধনপাদে বলা হয়েছে– "স্থিরসুখম্ আসনম্।"– অর্থাৎ দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্থির রেখে নিশ্চলভাবে সুখজনক অবস্থায় উপবেশনই আসন। আসনের দ্বারা সুস্থ ও নীরোগ দেহ লাভ করা যায়।

প্রাণায়াম: চতুর্থ যোগাঙ্গ হলো প্রাণায়াম। যোগীর আসন সিদ্ধ হলে তবে তার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম হলো বায়ুর শ্বাসরূপ আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ বহির্গতির বিচ্ছেদ। যোগসূত্রের সাধনপাদে বলা হয়েছে– "তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ"– অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতির বিচ্ছেদ বা ব্যতিক্রম করে রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা যা সমাধা করা যায়, তাকেই বলে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে দেহ-মনে বিশেষ করে ফুসফুসের উপকার হয়। করোনা ভাইরাস ফুসফুসকে আক্রমণ করে। ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ব্রিদিং বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তারদের মতে, এই করোনাকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। গীতায় জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণায়ামকে যোগসাধনার একটি পর্যায় বলেছেন। প্রাণায়াম সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন–অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু, প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু হোম করেন। অপরে মিতাহারী হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণসমূহে আহুতি দেন।[২৩]

প্রাণায়াম মূলত শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া, যার অভ্যাসে আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে শুদ্ধ স্পন্দনকে গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের অশুদ্ধ সবকিছুর বর্জন করতে পারি। এই প্রক্রিয়া মনকে জগৎ থেকে 'প্রত্যাহার' করতে সাহায্য করে। এরপর 'প্রত্যাহারকে' অনুসরণ করে আসে 'ধারণা', 'ধ্যান' ও 'সমাধি'।

আমাদের মধ্যে প্রায়ই মানসিক অস্থিরতা কাজ করে। এই মানসিক অস্থিরতা আমাদের শরীর ও মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমাদের অসুস্থতারও অন্যতম কারণ এই মানসিক অস্থিরতা। মানসিক চাপকে জয় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপায় হলো নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস করা। এখানে ধ্যানের অভ্যাস বলতে বিশেষ কোনো দর্শনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী সকলেই ধ্যানাভ্যাস করতে পারেন। এটা কোনো ধর্মীয় ব্যাপার নয়। এ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা আমাদের আবেগের শাসন থেকে ঊর্ধ্বে উঠে মানসিক চাপকে জয় করতে সাহায্য করে। এর ফলে দেহ ও মনে অপূর্ব এক শান্তি বিরাজ করে। এছাড়া ধ্যানের মাধ্যমেই শান্তভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা যায়।

মন ধ্যানাভিমুখী না হলে অস্থিরময় হয় জীবন। এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় হাজারো চিন্তা মনকে চঞ্চল করে তোলে। হারিয়ে যায় মানসিক ভারসাম্য। এই অশান্ত অস্থিরতার ফলে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শরীরেও নানা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। তাই

প্রতিদিন একটু সময়ের জন্য হলেও আমাদের ধ্যান করা উচিত। ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যিনি ধ্যানী তিনি বাহ্যিক জগতের আঘাত-সংঘাত থেকে পালিয়ে না গিয়ে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্তভাবে নির্ভীকচিত্তে তার সমাধান করতে পারেন। ধ্যানী ব্যক্তি তাই অতিমারীকে ভয় না পেয়ে, তার থেকে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে, দৃঢ় মনোবল দ্বারা তা প্রতিরোধ করতে পারেন।

অতিমারী বা মহামারী প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। *চরকসংহিতায়* ঋষি আত্রেয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, যা এ প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়েও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণ মানুষ প্রকৃতিকে অবহেলা করেছে। এখনও অবহেলা করে চলেছে। মানুষ যদি প্রকৃতিকে ভালোবেসে প্রকৃতি সংরক্ষণে এগিয়ে আসে, তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কমে আসবে। এর ফলে অতিমারী প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। সংস্কৃত শাস্ত্র প্রকৃতিকে কীভাবে দেখেছে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রকৃতিকে ভালোবাসা ও সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এ পৃথিবীর কোলে আমরা জন্মগ্রহণ করি, এরই আলো-ছায়া, মাটি-জলে বেড়ে উঠি। আবার জীবন সায়াহ্নে এই পৃথিবীর কোলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ঠিক মায়ের মতো এ পৃথিবী আমাদের ধারণ করেন, লালন করেন, পালন করেন। তাই অথর্ববেদের ঋষিকবি কৃতজ্ঞচিত্তে পৃথিবীকে ভালোবেসে বলেছেন:

... মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ ১২/১/ ১২

অর্থাৎ, পৃথিবী আমার মা, আমি তাঁর পুত্র।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভূমিবন্দনা করা হয়েছে অসাধারণভাবে:

ভূমৌ হি জায়তে সর্বং ভূমৌ সর্বং প্রণশ্যতি।
ভূমিঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং ভূমিরেব পরায়ণম্ ॥ –অর্থাৎ

এই মাটিতেই জন্ম সবার এই মাটিতেই ক্ষয়।
এই মাটিতেই জীবনধারণ সর্বভূতের আশ্রয় ॥

বৃক্ষ, লতা-পাতা,পাহাড়-নদী-সাগর অবিরাম সকল জীবের সেবা করে চলেছে। প্রকৃতিমাতা নিজেকে উজাড় করে আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাচীন ঋষিগণ এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁদের সাহিত্যকর্মে জীবনদর্শনের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রকৃতির বন্দনা

করা। তাঁরা প্রকৃতির প্রতিটা সত্তার মাঝে ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। আবার প্রকৃতিকে ভালোবেসে করেছেন আপনজন। তাই তাঁদের কাছে বৃক্ষ কখনও হয়েছে পুত্র কখনও বা পিতা। নদী কখনও দেবী, কখনও বা মানবীরূপেপ্রাণসত্তায় পূর্ণ প্রতিমা হয়েছে। বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকৃতিকে সংরক্ষণের কথা।

ঋগ্বেদের কবিরও এমন প্রার্থনা– এই পৃথিবীর আলো-বাতাস, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, প্রতি ধূলিকণা, ঊষা ও রজনী, দ্যুলোক, বনস্পতি,সমস্ত প্রকৃতি প্রাণবন্ত ও মধুময় হয়ে উঠুক।[২৪]

নশ্বর এ জীবন। তবুও ঋষিকবি সুখময় পার্থিব জীবনকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সুদীর্ঘ আয়ু, কর্মক্ষম সুস্থ দেহ, সজীব মন এবং আনন্দময় জীবনই ছিল আর্য ঋষিদের কাম্য। জীবনকে অস্বীকার না করে এই জীবনের সুধারস তাঁরা পান করতে ইচ্ছুক ছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁরা বিমুখ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন জীবনবাদী। তাই এই পৃথিবীকে ভালোবেসে, ঋষিকবি এই প্রাণময় সুন্দর ভুবনে সতেজ দেহ নিয়ে একশ' শরৎ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

একশ' শরৎ দেখব মোরা ভুবনভরা সুখে।
বাঁচতে চাইগো শত শরৎ সুস্থ-সবল বুকে।
শুনব কথা শত শরৎ হয়ে চির নবীন।
কইব কথা শত শরৎ অগ্নিভরা বীণ।
একশ' শরৎ অদীন আত্মা পূর্ণ স্বাধীন প্রাণ!
একশ' শরৎ পার হয়েও সতেজ বীর্য্যবান![২৫]

অতিমারীকে প্রতিরোধ করতে প্রয়োজন বৈদিক ঋষির মতো এমন ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় মনোবল।

সার্বিক আলোচনা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। যে কোনো অবস্থায় প্রকৃতিকে সুস্থিত রাখতে হবে। প্রকৃতি সুস্থিত না থাকলে বিপর্যয় ঘটবেই। অসংযমী হলে যেমন শরীরে নানা বিকার দেখা দেয়, নানা রোগের আক্রমণ হয় শরীরে, ঠিক একইভাবে প্রকৃতি সুরক্ষিত না হলে ঝড়-ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাস-মরূকরণ প্রভৃতি নানা অঘটন ঘটবে সেখানে। আর আমরা যেহেতু প্রকৃতিরই অংশ, সেহেতু প্রকৃতির বিপর্যয়ে আমাদের দেহ-মনওবিপর্যস্ত হবে। তাই যে-কোনোভাবে প্রকৃতির দূষণ বন্ধ করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে নদী-খাল-বিল ভরাট করা যাবে না। অপরিকল্পিতভাবে নদীতে বাঁধ

দেওয়া যাবে না, পাহাড় কাটা যাবে না, বন ধ্বংস করা যাবে না। আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বনজ ফল-মূল-পশুপাখি আহরণে ও গ্রহণে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। আমাদের জীবনচর্যায়ও স্বাভাবিকতা আনতে হবে। পরিমিত আহার ও বিশ্রাম করতে হবে। নিয়মিত যোগব্যায়ামের অনুশীলন করতে হবে। এ সকল স্বাস্থ্যবিধি সংস্কৃতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালের আলোচ্য এ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে আমরা যে-কোনো জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব। কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের কোনো প্যান্ডেমিক বা অতিমারী-মহামারী প্রতিরোধে আমরা সক্ষম হব।

তথ্যপঞ্জি

১. তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্ যথা – ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরূক্ষমত্যতিস্যন্দনমতিভৈর-ববারাবম প্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি ॥
চরক, বিমানস্থান, ৩/৭

২. উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ ॥ *চরক*, বিমানস্থান, ৩/৮

৩. দেশং পুনঃ বিকৃতপ্রকৃতিবর্ণগন্ধরসসংস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলমক্ষিকামূষকোলূকশ্মাশানিকশকুনিকশকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপোপবন বন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ব্ববদবপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্মাতপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসজ্ঘমুৎসৃষ্টনষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জা চারগুণ-জনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পম্ অতিভয়ারাবরূপং রূক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ ॥ *চরক*, বিমানস্থান, ৩/৯

৪. কালন্তু খলু যথর্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতালিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ ॥ *চরক*, বিমানস্থান, ৩/১০

৫. সর্ব্বেষামগ্নিবেশ বায়্বাদীনাং বদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ তন্মূলঞ্চাসৎকর্ম পূর্ব্বকৃতম্ তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব ॥ তদ্যথা;– যদা দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজনপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি ॥ *চরক*, বিমানস্থান, ৩/২০-২১

৬. রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ ॥
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্ ।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ ॥ *চরক*, বিমানস্থান,৩/১৬

৭. হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্ ।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
শঙ্কায়া ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্ ।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ ॥ *চরক*, বিমানস্থান,৩/১৭

৮. মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥
পতৎত্রিণাবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ ॥
... পতিতান্নমবক্ষুতম্ ॥ *মনুসংহিতা*, ৪/২০৭-২০৮, ২১৩

৯. ন মূত্রং পথি কুর্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে ॥
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন ॥
নসসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে ॥ *মনুসংহিতা*, ৪/৪৫-৪৭

১০. ন পন্থানমবমূত্রয়েৎ। ন জনবতি নান্নকালে ন জপ্যহোমাধ্যয়ন-বলিমঙ্গল-ক্রিয়াসু শ্লেষ্মশিঙ্ঘাণকে মুঞ্চেৎ। *চরক*,সূত্রস্থান,৮/১৯

১১. নাসংবৃতমুখো জৃম্ভাং ক্ষবথুং হাস্যং বা প্রবর্ত্তয়েৎ। ন নাসিকাং কুষ্ণীয়াৎ। ন দন্তান্ বিঘট্টয়েৎ।*চরক*,সূত্রস্থান,৮/১৪

১২. যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥৫/১০৬

১৩. ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥৫/১০৭
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৫/১০৯

১৪. ধর্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ।
শ্রেয়সেঽর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ *মহাভারত*, শান্তিপর্ব,২৯৭/৪০

১৫. *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, ১৯৩/৫ অনুশাসনপর্ব,১০৪/১৬,৪৩

১৬. *রামায়ণ*,অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০/১৭

১৭. কৃত্বা মূত্রমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ ॥
মহাভারত, বনপর্ব, ৫৯/৩, শান্তিপর্ব ১৯৩/৪, অনুশাসনপর্ব, ১০৪/৩৯

১৮. মেধ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমলক্ষ্মীকলিনাশনম্ ।
পাদয়োর্মলমার্গাণাং শৌচাধানমভীক্ষ্ণশঃ ॥ *চরক*, সূত্রস্থান,৫/৩৪

১৯. গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ। *মহাভারত*, উদ্যোগপর্ব, ৩৭/৩৩

২০. পবিত্রং বৃষ্যমায়ুস্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্ ।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্ ॥ *চরক*, সূত্রস্থান, ৫/৮

২১. কাম্যং যশস্যমায়ুষ্যমলক্ষ্মীঘ্নং প্রহর্ষণম্ ।
শ্রীমৎ পারিষদং শস্তং নির্ম্মলাম্বরধারণম্ ॥ *চরক*, সূত্রস্থান, ৫/৩১

২২. শতায়ুরুক্তঃ পুরুষঃ শতবীর্যাশ্চ জায়তে । *মহাভারত*,অনুশাসনপর্ব, ১০৪/১-৯
অকুর্ব্বন্ বিতিং কর্ম্ম প্রতিবিদ্ধানি চাচরন্ ।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যেবং নরো মিথ্যানুবর্ত্তয়ন্ ॥ *মহাভারত*,শান্তিপর্ব, ৩৪/২

২৩. অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৪/২৯

২৪. মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥॥ (*ঋগ্বেদ*, ১ম মণ্ডল, ৯০/৬-৮)

২৫. পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং,
শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতং,
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ *শুক্লযজুর্বেদ*, ৩৬/২৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত] (১৯৮৬)। *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা–৭০০০০৭।

অমলেশ ভট্টাচার্য, *রামায়ণ কথা* (২০১১)। প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, বইপাড়া পাবলিকেশনস্, কলকাতা।

কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার [অনূদিত], বৈদ্যাচার্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও আয়ুর্বেদাচার্য্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য [সম্পাদিত], (২০১৩) *চরক সংহিতা*, প্রথম খণ্ড [সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান], প্রকাশক: দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯।

করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা* (২০০৩)। রত্নাবলী, ৩৯-এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন (নবম তলা), ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩।

মহর্ষি বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, (১৯৭৬) প্রথম সংস্করণ, নিউ লাইট।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-*মহাভারতম্*, (বনপর্ব, ৮মখণ্ড), শান্তিপর্ব (৩৭খণ্ড), অনুশাসনপর্ব (৩৯ খণ্ড), শ্রীমৎ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ [অনূদিত] (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা ও অনূ]।(১৪১৬)। *মনুসংহিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা -৭০০০০৬।

যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়* (১৯৭৫), দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

রণদীপম বসু, (২০১৭)। *চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন* (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শন) দ্বিতীয় খণ্ড, রোদেলা প্রকাশনী, রুমি মার্কেট ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, (১৯৮৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, এ- ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা– ৭০০০০৭।

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, (১৯৭৬)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, এ- ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা– ৭০০০০৭।

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী [অনূ ও সম্পা] (১৯৯২)। *অথর্ববেদ*, তৃতীয় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭।

শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), প্রকাশক: শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। *মহাভারতের সমাজ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৪১)। *আমাদের পরিচয়*, বীণা লাইব্রেরী, প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, পঞ্চদশ সংস্করণ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩।

W. D. Whitney (Translator), K. L. Joshi (ed.), *Atharvaveda Samhita*, Parimal Publication, Delhi, First edition, 2000.